কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ষষ্ঠ অধ্যায়: বিদ‘আত ও বিভক্তি

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৬. ৬. ৩. শীয়া ফিরকা[1]

৬. ৬. ৩. ১.উৎপত্তি ও মূলনীতি

শীয়া ও খারিজী: মুসলিম উম্মাহর প্রথম ও প্রধান এদুটি ফিরকার উদ্ভব ঘটেছিল রাজনৈতিক কারণে। শীয়া (الشيعة) শব্দের অর্থ দল, অনুসারী, সাহায্যকারী ইত্যাদি। পারিভাষিকভাবে শীয়া বলতে শীয়াতু আলী (شيعة علي) বা আলীর (রাঃ) দল, আলীর অনুসারী বা আলীর সাহায্যকারী বুঝানো হয়। শীয়া ফিরকার মূল ভিত্তি আলী (রাঃ) তাঁর বংশধরদের জন্য রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের দাবি। এ দাবিকে কেন্দ্র করে অগণিত আকীদা তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)_এর আগমনের সময় আরবে কোনো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব না থাকলেও পার্শবর্তী অঞ্চলগুলিতে রাষ্ট্র বিদ্যমান ছিল। যদিও গ্রীসে এক সময় ‘ডেমোক্রাসী’ বা ‘গণতন্ত্র’ বলে কিছু চালু হয়েছিল তবে তা টিকে থাকে নি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)_এর আগমনের সময়ে বিশ্বের সর্বত্র রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল বংশতান্ত্রিক বা রক্তসম্পর্ক ভিত্তিক। রাষ্ট্রের মালিক রাজা। তার অন্যান্য সম্পদের মতই রাষ্ট্রের মালিকানাও লাভ করবে তার সন্তানগণ বা বংশের মানুষেরা। রাজ্যের সকল সম্পদ-এর মত জনগণও রাজার মালিকানাধীন। রাজা নির্বাচন বা রাজ্যপরিচালনা বিষয়ে তাদের কোনো মতামত প্রকাশের সুযোগ বা অধিকার নেই। রাজা তার রাজ্যের সম্পদ ও জনগণকে যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন।

এছাড়া অধিকাংশ ধর্মও ছিল বংশতান্ত্রিক। ইহূদী ধর্ম, পারস্যের মাজূস ধর্ম, মিসরের প্রাচীন ধর্ম ও অন্যান্য অনেক ধর্মবিশ্বাসের মধ্যেই রক্তসম্পর্কের বিশেষ ধর্মীয় মর্যাদা ও অলৌকিকত্বের বিশ্বাস বিদ্যমান ছিল।

এ সময়ে আরবে রাষ্ট্রব্যবস্থার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। আরবরা রাষ্ট্রিয় আনুগত্য বুঝতো না। তারা বুঝতো কবীলা বা গোত্র প্রধানের আনুগত্য। বিচ্ছিন্নভাবে ছোট বা বড় গোত্রের অধীনে তারা বাস করত। গোত্রের বাইরে কারো আনুগত্য বা অধীনতাকে তারা অবমাননাকর বলে মনে করত। এছাড়া ব্যক্তি সাতন্ত্র্যবোধ, স্বাধীনতাবোধ ইত্যাদি তাদেরকে নিজের মতের বাইরে অন্যের মত গ্রহণ করতে বাধা দিত।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সর্বপ্রথম আরবে একটি আধুনিক জগগণতান্ত্রিক পরামর্শ-ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এ ব্যবস্থার দুটি বিশেষ দিক ছিল: (১) রাজা ও প্রজার সম্পর্ক মালিক ও অধীনস্থের নয়, বরং মালিক ও ম্যানেজারের। তবে মালিক রাজা নন। রাষ্ট্রের মালিক জনগণ। রাজা তাদের খলীফা বা প্রতিনিধি বা ম্যানেজার হিসেবে তা পরিচালনা করবেন। জনগণই তাকে মনোনিত করবেন এবং জনগণ তাকে সংশোধন বা অপসারন করবেন। (২) রাষ্ট্রপ্রধান নির্ধারণ করা একটি জাগতিক কর্ম এবং তা জনগণের কর্ম। জনগণের পরামর্শের ভিত্তিতে তা সম্পন্ন হবে। পরামর্শের ধরন নির্ধারিত নয়। যুগ, দেশ ও জাতি অবস্থা অনুসারে তা পরিবর্তিত হতে পারে। যোগ্যতার মাপকাঠি রক্তসম্পর্ক নয়, বরং তাকওয়া। কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে অনেক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সাহাবীগণ কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনার আলোকে এভাবেই বুঝেছিলেন। তাঁরা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের ক্ষেত্রে

মতভেদ করেছেন, তবে বিভক্ত হন নি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওফাতের পরে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁর বংশের কেউ কেউ আশা করতেন যে, হয়ত আলীকেই (রাঃ) নির্বাচন করা হবে। আনসারগণ তাদের মধ্য থেকে খলীফা নির্বাচনের বিষয়ে চিন্তা করেন। শেষপর্যন্ত আবূ বাক্র (রাঃ)-কে খলীফা নির্বাচন করা হয় এবং আলী (রাঃ)-সহ সকল সাহাবী এ বিষয়ে একমত হয়ে যান।

ইসলামের বিশ্বজনীনতা অনুধাবনে অক্ষম, পূর্ববর্তী ধর্ম বা দেশীয় ব্যবস্থার প্রভাব বা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আগ্রহে উসমান (রাঃ)-এর সময় থেকে কিছু মানুষ প্রচার করতে থাকেন যে, ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা জনগণতান্ত্রিক নয়, বরং বংশতান্ত্রিক। ইসলামের ধর্মীয় বিধান ও ওহীর নির্দেশনা মোতাবেক রাষ্ট্রক্ষমতা বা ইমামত আলী (রাঃ) ও তাঁর বংশধরদের পাওনা। তাঁদের বাদে যারা ক্ষমতা গ্রহণ করেছে তাঁরা এবং তাদের অনুসারীগণ জালিম ও ওহী অমান্যকারী। সর্বোপরি তারা দাবি করে যে, আলী-বংশের রাষ্ট্রক্ষমতা বা ইমামতে বিশ্বাস করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ ও ঈমানের রুকন। তাওহীদ ও রিসালাতের বিশ্বাসের পরে বিশ্বাসের তৃতীয় রুকন হলো আলী (রাঃ) ও তাঁর বংশের ইমামতের সাক্ষ্য দেওয়া।

এ বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে আরো অনেক বিশ্বাস জন্ম নেয়, যেমন আলী (রাঃ) তাঁর বংশধরদের নিষ্পাপত্ব, নির্ভুলত্ব, উলূহিয়্যাত, গাইবী জ্ঞান, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও আলী (রাঃ)-এর পুনারাগমন, সাহাবীগণের বিচ্যুতি ইত্যাদি। ইতোপূর্বে আমরা কয়েকটি বিষয় আলোচনা করেছি।

ইমামতের এ ‘আকীদা’ কুরআন কারীমে কোনোভাবেই বিদ্যমান নেই। সাহাবীগণ কেউ তা জানেন নি। স্বয়ং আলী (রাঃ)ও তা কখনো দাবি করেননি। কোনো হাদীসেও তা স্পষ্টত নেই। কাজেই এ অভিনব বিশ্বাস প্রমাণ করতে তারা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে:

প্রথমত, তাফসীর বা ব্যাখ্যার পথ। ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, ইবনু সাবা কুরআনের কিছু আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যার আলোকে নিজের দাবি প্রমাণের চেষ্টা করত। পরবর্তী শীয়াগণ এরূপ অগণিত মনগড়া ব্যাখ্যার মাধ্যমে নিজেদের মত প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। কখনো শানে নুযুলের কাহিনী, কখনো কোনো মুফাস্সিরের বক্তব্য এবং কখনো নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা তারা পেশ করেছেন। সকল ক্ষেত্রে তারা কুরআনের মুতাওয়াতির বিষয়ের সাথে একক বর্ণনা, ব্যক্তিগত ঘটনা বা আভিধানিক ব্যাখ্যা সংযোজন করে আকীদার অংশ বানিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, যুক্তির পথ। আমরা দেখেছি যে, ইবনু সাবা যুক্তি পেশ করে যে, পূর্ববর্তী সকল নবী (আঃ) স্থলাভিষিক্ত রেখে গিয়েছেন, কাজেই মুহাম্মাদ (ﷺ) স্থলাভিষিক্ত না রেখে যেতে পারেন না। পরবর্তী শীয়াগণ এরূপ অনেক যুক্তি পেশ করেন। এসকল উদ্ভট যুক্তির মাধ্যমে ওহীর অতিরিক্ত মনগড়া বিষয়কে তারা আকীদার অংশ বানিয়ে নেন।

তৃতীয়ত, কুরআন বিকৃতির দাবি। শীয়াগন যে আকীদাকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়েছে কুরআন কারীমে কোথাও তা নেই। বিষয়টি তাদেরকে সর্বদা পরাজিত করে। এজন্য তাদের অনেকেই দাবি করেন যে, মূল কুরআনে আলী (রাঃ) তার বংশধরের ইমামতের বিষয়টি ছিল। তিন খলীফা ও সাধারণ সাহাবীগণ তা বিকৃত করেছেন। কুরআন মুখস্থ করা, খতম করা, নিয়মিত তাহাজ্জুদে ও তারাবীহের সালাতে খতম করা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে যার ন্যূনতম ধারণা আছে তিনিও অনুভব করেন যে, একান্তই মুর্খ না হলে কেউ এরূপ বিশ্বাস পোষণ করতে পারে না।

চতুর্থত, সাহাবীগণের বিচ্যুতির দাবি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আজীবন সাহচার্যে লালিত সাহাবীগণকে কুরআন

কারীমে নাজাত ও সফলতার মাপকাঠি বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে এ সকল উদ্ভট আকীদার কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। এজন্য শীয়াগণ সাহাবীগণকে সত্যবিচ্যুত ও ধর্মবিচ্যুত বলে বিশ্বাস করে। আমরা ইতোপূর্বে বিষয়টি আলোচনা করেছি।

পঞ্চমত, সাহাবীদের মাধ্যমে প্রাপ্ত হাদীস অস্বীকার। যেহেতু শীয়াগণ সাহাবীগণকে সত্যবিচ্যুত বলে বিশ্বাস করে, সেহেতু তারা তাঁদের মাধ্যমে বর্নিত কোনো হাদীস সঠিক বলে স্বীকার করে না। বরং তারা তাদের নিজেদের সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাদের ইমামগণের থেকে কিছু কথা সংকলন করে সেগুলিকে হাদীস বলে আখ্যায়িত করে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, তাদের সংকলিত এ সকল ‘হাদীসের’ সনদের ক্ষেত্রে সত্যমিথ্যা যাচাই তাদের মধ্যে খুবই নগণ্য।

ষষ্ঠত, ‘তাকিয়্যা’ বা ‘আত্মরক্ষার’ তত্ত্ব আবিষ্কার। শীয়াগণ যাদেরকে ঈমাম বলে দাবি করেন তারা মুসলিম সমাজের মূলধারার সাথে বাস করেছেন। আলী (রাঃ) তিন খালীফার খিলাফত স্বীকার করেছেন এবং তাদের সাথে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। তাদের প্রশংসা করেছেন। অনুরূপভাবে তাঁর বংশধরগণ। এগুলিকে বাতিল করার জন্য শীয়াগণ ‘তাকিয়্যা’ বা আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা বলার তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তারা দাবি করেন যে, আলী (রাঃ) ও ইমামগণ আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা বলতেন।

সপ্তমত, ব্যক্তির নিভুলত্ব ও বিশেষ জ্ঞান দাবির পথ। শীয়া বিভ্রান্তির অন্যতম দিক রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরে অন্য অনেক মানুষের নির্ভুলত্ব এবং আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্কের মাধ্যমে বিশেষ জ্ঞান লাভের আকীদা প্রচার করে। তারা প্রচার করে যে, কুরআন-হাদীসে সবকিছু নেই। এছাড়া কুরআন-হাদীসে যা আছে তা বুঝতেও আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক ও বিশেষ জ্ঞান প্রয়োজন। আর এরূপ জ্ঞান রয়েছে শীয়া ইমামগণ এবং তাঁদের প্রতিনিধিদের। কাজেই তারা যা কিছু বলবে সবই ওহীর জ্ঞান বলে গণ্য এবং আকীদার ভিত্তি। এভাবে অগণিত কুসংস্কারকে তারা আকীদা বলে চালিয়ে দেয়।

অষ্টমত, জালিয়াতির পথ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে ও ইমামগণের নামে অগণিত জাল হাদীস, জাল গল্প ও কাহিনী রটনা করা এবং সেগুলির মাধ্যমে নিজেদের উদ্ভট ও মনগড়া ‘আকীদা’গুলি প্রমাণ করা শীয়াগণের অতি-পরিচিত বৈশিষ্ট্য।

ফুটনোট

[1] শীয়া ফিরকা বিষয়ক তথ্যাবলির জন্য দেখুন: বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ২২-২৪, ২৯-৭২; শাহরাস্তানী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল কারীম, আল-মিলালু ওয়ান নিহাল ১/১৪৬-১৯৮; ড. আহমদ মুহাম্মাদ জালী, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ১৫১-৩৫৬; আন-নাদওয়াতুল আলামিয়্যাহ লিশ শাবাব আল-ইসলামী, আল-মাউসূ‘আতুল মুয়্যাস্সারাহ, পৃ. ৪৩-৫২, ২২১-২২৮, ২৫৫-২৬২, ২৯৭-৩০৬, ৩৯৩-৩৯৮, ৫০৯-৫১৮; মুহাম্মাদ আল-বুনদারী, আত-তাশাইউ’; মুহিববুদ্দীন আল-খাতীব, আল-খুতুতুল আরীযাহ; মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার আত-তোনসাবী, বুতলানু আকায়িদিশ শীয়াহ; ড. মূসা আল-মুসাবী, আশ-শীয়াতু ওয়াত তাসহীহ; আহমদ আল-ফওযান, আদওয়া আলাল আকীদাতিদ দুরযিয়্যাহ।

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন